Rajshahi University journal of arts & law
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 155-179
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0736

ISSN 2309-0898 (Print)
ISSN 2408-8773 (Online)

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ডানপন্থী রাজনীতি: নির্বাচনী প্রচারণার ভাষ্য ও প্রভাব
[The Seventh National Parliamentary Election of Bangladesh and Right-Wing Politics: Campaign Rhetoric and Influence]

হাফিজ আহমেদ*

Abstract

The Seventh National Parliamentary Election of Bangladesh, held on 12 June 1996, marked a significant turning point in the country's political history. Beyond ending a prolonged phase of political stalemate, the election was notable for the strategic use of right-leaning political narratives within electoral campaigns. This paper examines how key political actors framed issues such as independence, sovereignty, nationalism, privatization of state-owned enterprises, market liberalization and religious symbolism as central themes in their campaigns. Drawing on election manifestos, campaign speeches, newspaper reports, and printed materials, this study employs discourse analysis to explore the nature and impact of right-leaning political strategies. The evidence points to these narratives were instrumental in shaping voter perceptions and behavior, influencing both short-term electoral outcomes and longer-term ideological alignments in Bangladeshi politics. By analyzing the language and strategies adopted by political parties, particularly the Bangladesh Awami League, Bangladesh Nationalist Party, Jatiya Parti and Jamat-e-Islami Bangladesh this research contributes to understanding the adaptability of party ideology, the politicization of religion, and the growing influence of economic liberalism in a transitional democracy. The study offers new insights into the interplay between ideology, campaign rhetoric, and electoral success, and provides a valuable framework for future studies on party politics and voter behavior in Bangladesh.

Keywords: Seventh parliamentary election, Right-wing politics, Election menifesto, Religious ideology, Business elite.

ভূমিকা

১৯৯৬ সালের শুরুতে বাংলাদেশ একটি গভীর রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়। সে বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকারের অধীন সাধারণ নির্বাচন বিরোধী দলগুলো বর্জন করে[১] এবং সেই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দলগুলো একদলীয়, প্রহসনমূলক ও তামাশা'র নির্বাচন হিসেবে আখ্যা দেয়।[২] এর রেশ ধরেই ৯ মার্চ থেকে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, জাসদ ও জাগপাসহ অন্যান্য দল অভিন্নভাবে দেশব্যাপী অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করে।[৩] ফলে সমগ্র দেশজুড়ে ব্যাপক অসন্তোষ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন (নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার) জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি এই বিল-এ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এর মধ্য দিয়ে মাস ব্যাপি অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং দেশ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়। এ কারণে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নির্বাচনটি কেবলমাত্র ক্ষমতার

---

* পিএইচডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; E-mail: hafijhistory@hc.ku.ac.bd

পালাবদলের ক্ষেত্রেই নয়, বরং দেশের রাজনীতিতে ডানপন্থী[৪] মতাদর্শের অনুসঙ্গসমূহের কৌশলগত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর তুলনায় এই নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রচারণায় একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ডানপন্থী কৌশলগত অবস্থান ও ভাষিক বয়ানে। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহত্তর চারটি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ অপরাপর ক্ষুদ্র ধর্মভিত্তিক দলের ডানপন্থী রাজনীতির প্রচারণার ভাষা ও কৌশল বিশ্লেষণ করা এবং এর মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করা।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডানপন্থী রাজনৈতিক ভাষ্যের প্রকৃতি, প্রচারণার কৌশল এবং মতাদর্শগত প্রতিযোগিতা বুঝতে এই প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে বিশ্বাস করি। তাছাড়া, ডানপন্থী রাজনীতির সামগ্রিক গতিপথ অনুধাবনের জন্যও এই নির্বাচন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

গবেষণাকর্মটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক দলের ডানপন্থী রাজনীতির প্রচারণার কৌশল ও ভাষ্য চিহ্নিত করা এবং এই ভাষ্য কীভাবে ভোটারদের মনোভাব ও নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করেছিল তা বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন

(i) সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণায় ডানপন্থী রাজনীতির কোন ধরণের আদর্শিক উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে?

(ii) কোন কোন রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে ডানপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তাদের প্রচারণায় তা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

(iii) ডানপন্থী রাজনীতির কোন কৌশলসমূহ নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে?

গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত গুণগত (Qualitative) ও বিশ্লেষণভিত্তিক (Analytical) গবেষণা। যেখানে ঐতিহাসিক দলিলপত্র, নির্বাচনী ইশতেহার, সংবাদপত্র-সাময়িকি, দলীয় ঘোষণাপত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষণসমূহ মূল তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সহায়ক তথ্যসূত্রের মধ্যে রয়েছে: প্রবন্ধ, গ্রন্থ,গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি। উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis), বক্তব্য বিশ্লেষণ (Discourse Analysis) ও তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Study) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা

বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণাধর্মী বই, প্রবন্ধ ও এমফিল-পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রয়েছে। এ সকল রচনাবলীর মধ্যে *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র-১৯৯১-২০০৮*[৫], *বিশ শতকে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন*[৬], *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*[৭], *বাংলাদেশের রাজনীতি*[৮], *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization*[৯] "God and the Ballot Box: How Electoral Candidates Use Religion in Election Campaign in Bangladesh"[১০], "Political Parties Movements: Elections and Democracy in Bangladesh"[১১], "বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি"[১২], "বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম"[১৩], "PRESSURE GROUPS IN BANGLADESH

POLITICS"[১৪] প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের নানারূপ বিশ্লেষণ থাকলেও বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায় ডানপন্থী রাজনীতির প্রচারণার ভাষ্য ও প্রভাব সম্পর্কিত সুসংহত ও প্রমাণ সমর্থিত বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। এই গবেষণায় সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য স্থির করে নির্বাচনী প্রচারণার ভাষ্য: পুঁজিবাদি মুক্তবাজার অর্থনীতি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ভাবাদর্শের ব্যহারের মাধ্যমে সংগঠিত ডানপন্থী রাজনীতির অনুসঙ্গ কীভাবে মাঠ-পরিচালনা এবং তা ভোটের ফলাফল নির্ধারণে প্রতিফলিত হয়েছে; তার তুলনামূলক ও দলিলভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনে ডানপন্থী প্রচারণার ভাষ্য

এই নির্বাচনে ডানপন্থী রাজনীতির উপাদানসমূহ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। প্রধানত আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয়পার্টি এবং অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রচারণায় বিশেষ করে নির্বাচনী ইশতেহারে ও নির্বাচনী প্রচারণায় ডানপন্থী রাজনীতির অনুসঙ্গ ব্যবহার করে ভোটারদের আকৃষ্ট করে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের দালিলিক বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. নির্বাচনী ইশতেহারে ডানপন্থী রাজনীতি: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯৬) উপলক্ষে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ডানপন্থী রাজনীতির উপাদান ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। নিচে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিসহ কয়েকটি দলের ইশতেহারে প্রতিফলিত ডানপন্থী রাজনীতির অনুসঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো-

ক. ১. পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয়। ব্যাংক ও বিমা খাত, ভারী ও বৃহৎ শিল্প যেমন-লৌহ, ইস্পাত, ধাতু, খনিজ, বিদ্যুৎ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পাট, বস্ত্রশিল্প, চিনি শিল্প ও পরিবহন খাতের একটি বড় অংশ জাতীয়করণ করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবণতার প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে সরে এসে পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয়। এই ধারা এলিট ও ব্যবসায়ী শ্রেণির কাছে দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনী প্রচারণায় মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বেসরকারি খাতের পক্ষে অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলসমূহ কীভাবে পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতির পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে তা তুলে ধরা হলো-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: দলীয় গঠনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের জন্য সে অবস্থান থেকে সরে এসে পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করে এবং নির্বাচনী প্রচারণার ভাষ্যে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালের ১০ মে আওয়ামী লীগ ২১ দফা সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারের ৫ নং দফায় বলা হয়,

> আওয়ামী লীগের শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হবে দেশজ শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রপ্তানিবৃদ্ধি। আওয়ামী লীগ পোশাক, পাট ও পাটজাত বা চা, তামাক, চামড়া ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পকে অগ্রাধিকার দেবে। তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে তাঁতীদের কাছে ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহ, তাঁত ঋণ মওকুফ, ঋণদান ও

> উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে। কামার, কুমার, জেলেসহ বিভিন্ন কর্মজীবীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পখাতকে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে...।[১৫]

এই ইশতেহারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, 'মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা' অনুসরণের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্যক্তি উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পখাতকে উৎসাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক বৈধতা ও জনসমর্থন বজায় রাখার জন্য সমাজতান্ত্রিক ঘোষণাপত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নীতি পরিবর্তন করেছে এবং পুঁজিবাদ ও বাজার অর্থনীতিকে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। নির্বাচনী জনসভায় দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার ভাষণে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): ১৯৯৬ সালের ১৮ মে বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়,

> বিএনপি উদার ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ এবং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিএনপি সংস্কার কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক ও গভীর করবে।...রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।... দেশী ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উৎস। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং সহায়ক অন্যান্য সার্ভিস যথা- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আমলাতান্ত্রিক অবকাঠামোর সংস্কার করা হবে। সকল অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হবে...।[১৬]

এই ইশতেহার থেকে বোঝা যায়, বিএনপি তৎকালীন বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজারমুখী, বিনিয়োগ-উদ্দীপক ও সংস্কার-প্রবণ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও এতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে বাদ দেওয়া হয়নি, তবে এর গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে এবং জোর দেয়া হয়েছে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণের উপর। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক সংকেত অর্থাৎ বিএনপি অর্থনীতিকে উদারীকরণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চায় এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগবান্ধব নীতিকে তাদের অন্যতম শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে। এছাড়াও দলীয় চেয়াপার্সনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী জনসভায় পুঁজিবাদি-মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে নানাভাবে বক্তব্য প্রদান করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: ১৯৯৬ সালের ৫ মে জামায়াত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে এবং ইশতেহারে বলা হয়,

> দেশের শিল্প বিকাশের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মুক্তবাজার ব্যবস্থা চালু করা হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। দেশজ শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর হইতে কর প্রত্যাহার বা হ্রাস করা হইবে...।[১৭]

সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী এই ইশতেহারে ইসলামী আদর্শভিত্তিক অর্থনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে নৈতিকতা, মুক্তবাজার, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন ভাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টি: ১৯৯৬ সালের ৯ মে ৩৬ দফা সম্বলিত ইশতেহারে পুঁজিবাদী নীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন: ... দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যাপক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ; পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান...; ...উপযুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে টিভি চ্যানেল চালু করার অনুমতি প্রদান করা হবে। সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা, টাইমস ও দৈনিক বার্তা বেসরকারিকরণ করা হবে।[১৮] এই ইশতেহারে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিবর্তে বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলা হয়, যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও গণমাধ্যম ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী নীতির প্রভাব দেখা যায়। উপযুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে টিভি চ্যানেল চালুর অনুমতি দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়, যা রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে বেসরকারি মালিকানার প্রসার ঘটায়। একই সঙ্গে সরকারি মালিকানাধীন *দৈনিক বাংলা*, *দ্য টাইমস* ও *দৈনিক বার্তা* পত্রিকা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সংকুচিত করে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে উক্ত ইশতেহারে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।

জাকের পার্টি: ১৯৯৬ সালের ১০ মে জাকের পার্টি ৪০ দফা সম্বলিত ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারে পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়,

> জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুচিন্তিত প্রয়োগ করা। বিশ্ব বাজারে শিল্প-সমূহে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য শিল্পে মৌল উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারী শিল্পের উন্নয়নে বিদেশী পুঁজি যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানান ও সার-কীটনাশক বাজারের উন্নয়নের বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করা, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকার সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা উন্নত বিশ্বের ভারী ও শ্রম নির্ভর শিল্পের স্থানান্তর সুবিধা প্রদান।[১৯]

এই ইশতেহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও, জনকল্যাণের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রের একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকার ইঙ্গিতও প্রদান করা হয়েছে।

ক. ২. স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদ

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ২১ দফা সম্বলিত ইশতেহারের ১৯ নং দফায় উল্লেখ করা হয়- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী বিডিআরকে যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করা হবে। সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে স্থাপন করা হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ।'[২০] উক্ত দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রধান ভিত্তি হিসেবে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং বিডিআরকে যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করার অঙ্গীকার জাতীয় সীমান্ত, আকাশসীমা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যের প্রতিফলন।

বিএনপি: ২৫ পৃষ্টা সম্বলিত ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়-'প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী বিডিআরকে যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করা হবে। সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে স্থাপন করা হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ।'[২১] এর মধ্য দিয়ে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ও আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য-এই ধারণাই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: ৮ মে প্রকাশিত ইশতেহারে দলটি যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সেটি হলো-

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজতের লক্ষ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথার্থ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা- বাহিনী গড়ে তোলা হবে...জনগণের মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগ্রত করা হবে যাতে তারা দেশ জাতির জন্য হাসিমুখে জান-মাল কুরবাণী করতে এগিয়ে আসে।...১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সকল সক্ষম নাগরিককে নূ্যনতম প্রতিরক্ষা ট্রেনিং প্রদান করা হবে।[২২]

এখানে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগ্রত করার কথা বলার মাধ্যমে প্রতিরক্ষাকে কেবল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দায়িত্ব নয়, বরং একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী সকল সক্ষম নাগরিককে ন্যূনতম প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাবটি গণভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (people's defense) গড়ে তোলার ধারণা প্রকাশ করে।

জাতীয় পার্টি: দলটির ইশতেহারে যে বিষয়টি প্রাধান্য পায় সেটি হল- 'সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন। জাতিগঠনমূলক কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পৃক্ত করা হবে।'[২৩] এই বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনীকে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শক্তি ও জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতিগঠন উভয় লক্ষ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ক. ৩. ইশতেহারে ধর্মীয় ভাবাদর্শের ব্যবহার: বড় দলগুলোর পাশাপাশি ছোট দলগুলোও ভোটারদের সমর্থন লাভের জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব ধর্মীয় ভাবাদর্শ অন্তর্ভুক্ত করেছে সেগুলো হলো-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ইশতেহারে দলটি উল্লেখ করে যে,'ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় ও গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকার ও সুযোগের পরিপন্থী আইন বিলোপ করা হবে।'[২৪] এর মাধ্যমে দলটি ধর্মকে সমাজে সমতার ও ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বিএনপি: বিএনপি ইশতেহারে উল্লেখ করে '...ইসলামী মূল্যবোধ, ঈমান-আকিদা রক্ষা ও উজ্জীবিত করা হবে। এই আলোকে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো হবে। ...সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী।'[২৫] এটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিএনপির এই ইশতেহার ধর্মীয় নৈতিকতা, ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক নীতির সমন্বয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত, যা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে সমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিকভাবে প্রকাশ করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে। কুরআন ও সুন্নাই হবে প্রজাতন্ত্রের সকল আইনের উৎস...।'[২৬] জামায়াতে ইসলামী এই ইশতেহারে রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী নীতিমালাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার লক্ষ্য প্রকাশ করেছে। এটি দলের কট্টর ডানপন্থী, ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন, যেখানে ধর্মীয় আইন ও আদর্শকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়।

জাতীয় পার্টি: ধর্মীয় অনুসঙ্গকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দলটির ইশতেহারের ২৮ নং ধারায় উল্লেক করা হয় 'জাতীয় পার্টি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রবর্তন করবে না এবং সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ইসলামিক কমিশন গঠন করা হবে।'[২৭] এই ইশতেহারিক ঘোষণায় জাতীয় পার্টির ধর্মীয় রক্ষণশীল ও ডানপন্থী রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে ইসলামী আদর্শ, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

জাকের পার্টি: দলটির নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়,'ধর্মীয় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের দ্বারা নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং ইসলামের উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে সহনশীলতা অর্জন...।'[২৮] জাকের পার্টির এই ঘোষণায় ধর্মীয় পুনর্জাগরণকে নৈতিক সংস্কারের উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে, তবে তা কঠোরতা নয়-বরং ইসলামের মানবতাবাদী ও উদারনৈতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজে সহনশীলতা, নৈতিকতা ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী ফ্রন্ট: ইসলামী ফ্রন্ট নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে 'ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশকে একটি ইসলামী আদর্শ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিণত করতে চায়।'[২৯] এই ইশতেহার একটি ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিফলিত করছে, যেখানে ইসলামী নীতি ও সমাজকল্যাণকে সমন্বিত করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ: ১৯৯৬ সালের ২২ মে এ দলটির ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়,'আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি প্রার্থনাই জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য।'[৩০] এই ইশতেহার ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দর্শন, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং মানবকল্যাণের সংমিশ্রণ প্রতিফলিত করছে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নৈতিক ও শাসনগত নির্দেশনার সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে জনগণকে নৈতিক ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ: দলটির ইশতেহারে বলা হয়, 'বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে এবং মহান ইসলামের ভিত্তিতে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।'[৩১] বাংলাদেশ মুসলিম লীগের এই ইশতেহার একটি আদর্শগত ঘোষণাপত্র যা রাষ্ট্র, সমাজ ও আইনের গঠনপ্রকৃতি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

খ. নির্বাচনী প্রচারণায় ডানপন্থী রাজনীতি: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও জনসভায় দলীয় প্রধানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ভাষণে ডানপন্থী রাজনীতির যে চিত্র পাওয়া যায়, তা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

খ. ১. পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি: পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন জনসভায় রাজনীতিকদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ নিম্নরূপ-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ২৮ মে ঢাকার বারিধারায় নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, "ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করবে।"[৩২] ৩১ মে গাজীপুরে অপর এক জনসভায় তিনি বলেন, "কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ করা হবে না। বিদেশি

বিনিয়োগ আহরণ এবং ব্যক্তি মালিকানায় যাতে ব্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই পদক্ষেপ নেয়া হবে।"[৩৩] আওয়ামী লীগের সভাপতির এই বক্তব্যগুলো দলটির অর্থনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। ২৮ মে বারিধারার জনসভায় এবং ৩১ মে গাজীপুরের সমাবেশে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সম্প্রসারণ না করে বেসরকারি খাত ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

বিএনপি: ৩১ মে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "দেশে অধিক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যখনই এগিয়ে এসেছে তখনই আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকে তাদের আসার পথরুদ্ধ করে দিয়েছে।"[৩৪] বেগম খালেদা জিয়ার এই বক্তব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক প্রচারণা কৌশল বা দোষারোপমূলক আক্রমণাত্মক ভাষ্যের উদাহরণ। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগমন ও শিল্প সম্প্রসারণের প্রসঙ্গ টেনে এনে দাবি করেন যে আওয়ামী লীগের আন্দোলন (বিশেষত হরতাল) দেশের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: এ প্রসঙ্গে ২২ মে মোহাম্মদপুর টাউন হলে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী বলেন,"নির্বাচনে দেশের জনগণ জামায়াতের পক্ষে রায় প্রদান করলে জামায়াত ইসলামী যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করে দেশকে দারিদ্রমুক্ত করবে।"[৩৫] সার্বিকভাবে, জামায়াতের নির্বাচনী ভাষ্য একটি আদর্শিক-বাস্তববাদী সমন্বয়। তারা মুক্তবাজার ও বিনিয়োগবান্ধব নীতিকে গ্রহণ করলেও সেটিকে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে যুক্ত করেছে, যা একদিকে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ধরে রাখে, অন্যদিকে সমসাময়িক অর্থনৈতিক চাহিদার প্রতিও সাড়া দেয়। এই কৌশলটি ছিল ভোটারদের কাছে এক নতুন বার্তা।

খ. ২. স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদ

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। নির্বাচনী ভাষ্য ও ইশতেহারগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। দলগুলো এই বিষয়সমূহকে ভোটারদের আবেগ ও দেশপ্রেমের সাথে সংযুক্ত করে তাদের সমর্থন আদায়ের কৌশল গ্রহণ করে, যা তখনকার রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় আবেগময় জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সকে কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নে এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হলো:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: নির্বাচনী প্রচরণায় দলীয় সভাপতিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ ও নৌকা প্রতীককে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করে। নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

৪ মে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ ফাউন্ডেশন কর্তৃক কর্মসূচীতে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং হারানো গৌরব ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।[৩৬] ২২ মে মিরপুর উপশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনী জনসভায় শেখ হাসিনা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ও শান্তি সমৃদ্ধির প্রতীক নৌকা মার্কায় ভোট দেবার অনুরোধ করেন।[৩৭] নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার এই বক্তব্যগুলো স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী আবেগ ও মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকারকে রাজনৈতিক প্রচারণার কেন্দ্রে স্থান দেওয়ার কৌশল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

১৯ মে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশে আর কেহ বাঙালি হইয়া থাকিতে পারিবে না। দেশে মধ্যযুগীয় বর্বরতা নামিয়া আসিবে।"[৩৮] এই বক্তব্যের মাধ্যমে শেখ হাসিনা জাতিগত পরিচয়কে কেন্দ্র করে ভীতি সৃষ্টির কৌশল ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

২৩ মে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ সূত্রাপুরে এক জনসভায় বলেন,"আওয়ামী লীগই বুকের রক্ত দিয়া স্বাধীনতা আনিয়াছে আওয়ামী লীগই প্রয়োজনে রক্ত দিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে।"[৩৯] ২৮ মে গুলশানে শেখ হাসিনা বলেন, "১৯৭০ সালে নৌকার ভোট দেশকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়েছিল এবারের নৌকায় ভোট দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক মুক্তি দেবে।"[৪০] ৩০ মে মাদারীপুর-৩ আসনের প্রার্থী সৈয়দ আবুল হোসেন অনুরূপ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের হাতেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত থাকিবে।"[৪১] ৩ জুন ফেনীর সোনাগাজীতে অপর এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, "আপনারা ৭০ সালে নৌকায় ভোট দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। আরেকবার নৌকায় ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য আওয়ামী লীগকে সুযোগ দিন। আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের ভোটে যদি আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারে তাহলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কায়েম করার জন্য কাজ করে যাব।"[৪২] সার্বিকভাবে, এসব বক্তব্যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আবেগ সৃষ্টি করে নৌকা প্রতীককে নির্বাচনী কৌশলের কেন্দ্রে স্থাপন করে ভোটারদের কাছে স্বাধীনতার ধারক ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একমাত্র যোগ্য দল হিসেবে তুলে ধরেছে। এই ধরণের প্রচারণা ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী আবেগকে রাজনৈতিক পুঁজিতে রূপান্তরের কৌশল।

বিএনপি: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের চেয়ারপার্সনসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভা ও নির্বাচনী মঞ্চে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ এবং সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্যে নানাভাবে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করেছেন। এসব বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশপ্রেমের আবেগকে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা ভোটারদের আবেগগতভাবে প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য বিশ্লেষণ করা হলো-

১১ মে চট্টগ্রামে নির্বাচনী জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন,"নির্বাচনে আপনাদের ভোটের উপর নির্ভর করছে এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব থাকবে কি থাকবে না। দেশ আবার দুর্ভিক্ষের অতল সাগরে পড়বে কি পড়বে না। বিএনপি এদেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের প্রতীক। যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেন তাহলে দেশ আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে, দেশে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।"[৪৩] ১৪ মে স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী আওয়ামী লীগ'কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যারা দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয় ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে জনগণ তাদের ভোট দেবে না।"[৪৪] ১৫ মে ফেনীর পরশুরামে সাঈদ ইস্কান্দার বেগম খালেদা জিয়ার অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করে বলেন, "আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উপর নির্ভর করছে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না।"[৪৫] বিএনপির নেতৃবৃন্দের এসব বক্তব্যে ভোটারদেরকে আবেগগতভাবে প্রভাবিত করার জন্য ভীতি, সংকটের ইঙ্গিত প্রদান, প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে নেতিবাচকভাবে চিত্রায়ন এবং নিজেদেরকে স্বাধীনতা ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়। ২৫ এপ্রিল ফরিদপুরের কানাইপুর হাইস্কুল মাঠে জনসভায় চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ বলেন, "চিন্তা-ভাবনা করে এবারের সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে হবে। বিএনপি ছাড়া অন্য কোন দল ক্ষমতায় গেলে ১৯৯৭ সালে আবার সে চুক্তি নবায়ন করবে। বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এ দল কখনো এ গোলামি চুক্তি নবায়ন করবে না। ধানের শীষে ভোট দিয়ে

আপনাদেরই বিদেশী চক্রান্ত রুখতে হবে।"[৪৬] ১০ মে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিএনপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন-"স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।"[৪৭] ১৪ মে কিশোরগঞ্জে অরেকটি জনসভায় খালেদা জিয়া বলেন, "স্বাধীনতার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা বাংলার মানুষের হাতে-পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়েছিল অন্য দেশের কাছে দেশকে বন্ধক দিয়েছিল। তারা ক্ষমতায় গেলে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাবে।"[৪৮] ২০ মে ফুলবাড়িয়ায় ময়মনসিংহ-৬ আসনের প্রার্থী মোঃ শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "দেশের গণতন্ত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আগামী ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন।"[৪৯] ২ জুন নেত্রকোনায় বেগম খালেদা জিয়া একই ধরণের বক্তব্যদান করে বলেন,"আল্লাহর আশীর্বাদ দেশের শান্তি,স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টির প্রতীক হচ্ছে ধানের শীষ।"[৫০] ৫ জুন মানিকগঞ্জে বেগম খালেদা জিয়া একই ধরণের বক্তব্য দেন। তিনি বলেন,"স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ধানের শীষে ভোট দিন।"[৫১] এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে বিএনপির নির্বাচনী কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিদেশি চক্রান্ত প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্রে রেখে নিজেদেরকে ভোটারদের কাছে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো। সেইসাথে প্রতিদ্বন্দ্বী দল আওয়ামী লীগ'কে অবিশ্বস্ত বা পরাধীনতার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা এবং নিজেদেরকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদার একমাত্র রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা।

জামায়াতে ইসলামী: নির্বাচনের প্রাক্কালে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশকে ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য দিলেও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সম্বলিত কোন বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি নির্বাচনী ইশতেহার উপলক্ষে ৬ মে *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় দলীয় প্রধান গোলাম আজমের ভাষণ প্রকাশিত হয়, সেখানেও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সম্বলিত তেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

ইসলামী মোর্চা: ১৭ মে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব মুফতী আমিনীর বক্তব্যটি হলো, "দেশ, ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইসলাম, মুসলমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিবে কি থাকিবে না আগামী নির্বাচনে দেশবাসীকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইসলাম বিরোধী শক্তি বিশেষত এনজিওরা দেশ দখলের চক্রান্তে মাতিয়াছে।"[৫২] মুফতী আমিনীর বক্তব্য নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় আবেগ, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং ভয় প্রদর্শনের কৌশল ব্যবহার করে ভোটারদের আকৃষ্ট করার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এই ধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নিজেদেরকে ইসলাম রক্ষার একমাত্র যোগ্য শক্তি হিসেবে চিত্রিত করেছে।

খ. ৩. ধর্মীয় ভাবাদর্শের ব্যবহার

সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সমর্থন অর্জনের অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে ধর্মকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে। অধিকাংশ দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণায়- যেমন: জনসভা, মাজার জিয়ারত, স্লোগান, পোস্টারে ডানপন্থী রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিশেষত ধর্মীয় আবেগ ও পরিচয়কে কৌশলগতভাবে কাজে লাগায়। এই প্রচারণার মাধ্যমে ভোটারদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, আস্থা এবং বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। এর ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ধর্ম কেবল নৈতিক বা সামাজিক উপাদান হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা ডানপন্থী রাজনীতির শক্তিকে আরও সুসংহত করে এবং ভোটারদের আচরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। নিম্নে ধর্মীয় ভাবাদর্শের ব্যবহারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হলো-

খ. ৩. ১. নির্বাচনী জনসভায়

নির্বাচনকে ঘিরে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ বিশেষত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জামায়াতে ইসলামী'র আমীর গোলাম আজম, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা- সারাদেশে নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন কৌশলে ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধকে ব্যবহার করেছেন। নিম্নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্যে ধর্মের ব্যবহার তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ দল হলেও নির্বাচনী প্রচারণায় দলীয় প্রধানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ধর্মীয় শব্দের ব্যাপক ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৯৬ সালের ২৪ মে পঞ্চগড়ে শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই তবে মানুষের জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।"[৫৩] ৩১ মে ফেনীতে অপর এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, "আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সেই সরকার জনগণের সেবক হবে।"[৫৪] উল্লিখিত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় অনুভূতি এবং রাজনৈতিক বার্তাকে একীভূত করার কৌশল গ্রহণ করেছেন। উভয় বক্তব্যে 'আল্লাহর মেহেরবানীতে' শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন, যা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একইসাথে তিনি 'জাতীয় ঐকমত্য,' 'জনগণের সেবক' ইত্যাদি ধারণা তুলে ধরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনমুখী নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

বিএনপি: ১৯৯৬ সালের ৪ মে বিএনপি'র পার্টি অফিসে জাতীয় পার্টির সাবেক মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান ও মিয়া মনসুর আলী, প্রতিমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন আল আজাদ বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে বেগম খালেদা জিয়া ধানের শীষকে মঙ্গল ও ভাগ্য লক্ষ্মীর প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন।[৫৫] ১১ মে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বেগম খালেদা জিয়া ধানের শীষ'কে মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, "এতে ভোট দিলে আপনাদের মঙ্গল হবে দেশের মঙ্গল হবে। ধানের শীষ হচ্ছে লক্ষ্মী।"[৫৬] ২২ মে জামালপুরে বেগম খালেদা পুনরায় ধানের শীষ'কে লক্ষ্মী ও মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'নৌকা' দুর্ভিক্ষের প্রতীক।[৫৭] উল্লেখিত বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনী প্রচারণায় দলীয় প্রতীক 'ধানের শীষ'কে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক এবং মানসিকভাবে ইতিবাচক প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 'মঙ্গল,' 'ভাগ্য লক্ষ্মী,' এবং 'লক্ষ্মী' শব্দের ব্যবহার এখানে শুধু একটি রাজনৈতিক প্রতীক নয়, বরং এটি একটি শুভ, কল্যাণকর এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ভোটারদের মনে প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা।

১২ মে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার দেওদিঘী মাঠে এক জনসমাবেশে কর্নেল অলি আহমদ বলেন, "আমরা যদি মুসলমান হই, যদি কলেমায় বিশ্বাস করি, তাহলে ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। ধানের শীষে ভোট না দিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন বেগম খালেদা জিয়ার মাধ্যমে বিএনপি ইসলাম কায়েম করবে।"[৫৮] ১৯ মে কিশোরগঞ্জ স্টেডিয়ামের বিরাট সমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন,

> আসন্ন নির্বাচন এ জাতি ও জনগণের সামনে এক বিরাট পরীক্ষা হিসাবে হাজির হইয়াছে। নির্বাচনে নির্ধারিত হইবে, সংবিধানে জিয়াউর রহমানের সন্নিবেশিত বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও আল্লাহর উপর অগাধ

> বিশ্বাসের জাতীয় অঙ্গীকার থাকিবে কি থাকিবে না। তিনি আরো বলেন, বিএনপি'কে ভোট দিলেই বিস্‌মিল্লাহ থাকবে এবং আওয়ামী লীগ জয়ী হলে আবার দেশ শৃঙ্খলিত ও পরাধীন করিয়া দেবে।[৫৯]

এই বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপর্সন সংবিধানে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এবং "আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস" এর উল্লেখকে ধর্মীয় আস্থা ও জাতীয় পরিচয়ের অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এভাবে বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন বিএনপিকে ভোট দেওয়া মানে এই ধর্মীয় উপাদান রক্ষা করা, আর আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে তা বিলোপ হবে। ২৭ মে লক্ষ্মীপুরে জনসভায় খালেদা জিয়া ধানের শীষকে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, শান্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক হিসেবে অভিহিত করে বলেন-এ প্রতীক আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬০] সামগ্রিকভাবে এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতীকভিত্তিক রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মীয় অনুভূতির সমন্বয়ে জনমত গঠনের একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলের প্রতিফলন দেখা যায়।

জামায়াতে ইসলামী: ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হওয়ায় নির্বাচনী জনসভায় জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় ধর্মীয় উপাদানের ব্যবহার সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের ভাষণে প্রায়শই কোরআন, হাদিস, আল্লাহ, ঈমান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা সম্পূর্ণ বক্তব্যকে ধর্মীয় আবহে আচ্ছাদিত করে। নিম্নোক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা পাওয়া যাবে-

১৯৯৬ সালের ৫ মে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় এক জনসভায় জামায়াত নেতা ফজলুল করিম বলেন," আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া বাংলার জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।"[৬১] ১০ মে কক্সবাজার জেলায় ৫টি জনসভায় জামায়াতের আমীর গোলাম আজম বলেন,"জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"[৬২] ১৫ মে কুষ্টিয়ার মিরপুরে জনসমাবেশে তিনি অনুরূপ বক্তব্যে বলেন, "দেশের মানুষ আল্লাহর আইন চায়, না ইংরেজদের গোলামী আইন চায়; সে বিষয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের শান্তি জন্য আল্লাহর আইনের পক্ষে রায় দিন।"[৬৩] ৩১ মে সিলেটে গোলাম আজম বলেন, "আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।"[৬৪] এই বক্তব্যগুলো জামায়াতে ইসলামী'র রাজনৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে স্পষ্ট করে তোলে সেটি হলো রাজনীতিতে ধর্মকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন এবং 'আল্লাহর আইন'কে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা। ফজলুল করিম ও গোলাম আজমের বক্তৃতায় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও 'সৎ নেতৃত্ব'-এর আহ্বান জনগণকে আবেগতাড়িত করার একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষকরে 'ইংরেজদের গোলামী আইন' শব্দ ব্যবহার করে তারা প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোকে বিদেশি ও অমুসলিম প্রভাবিত হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে তারা ভোটারদের সামনে ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করেছেন। এই ধরনের বক্তব্য ডানপন্থী রাজনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় ধর্মকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও জামায়াত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীককে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে জনগণের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন। ১১ মে জয়পুরহাটে জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, "আল কুরআনের শাসন কায়েম হলে মুসলমান-হিন্দুসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে।"[৬৫] ২৪ মে জয়পুরহাটে অপর এক জনসভায় তিনি বলেন, "কোরআনের পার্লামেন্ট ছাড়া সোনার বাংলা সম্ভব নয়।"[৬৬] ২৪ মে যাত্রাবাড়ীতে জামায়াত দলীয় প্রধান গোলাম আজম বলেন,"উন্নয়ন ও আইনের শাসন চাইলে ইনসাফের প্রতীক দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।"[৬৭] ১ জুন ময়মনসিংহে তিনি পূর্বের দেয়া বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন,

"জামায়াত ইসলামী'ই পারে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে।"[৬৮] উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় আবেগ, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দলীয় প্রতীকের মাধ্যমে একটি সুসংহত প্রচারণা কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষকরে সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান ও দলীয় প্রধান গোলাম আজমের বক্তব্যগুলোতে কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যেমন-ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার ধারণার উপর গুরুত্বারোপ, সমতা ও অন্তর্ভুক্তির বার্তা, দলীয় প্রতীকের অর্থবহ ব্যবহার ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আহ্বান। অর্থাৎ এই বক্তব্যগুলোতে ধর্মকে কেবল আধ্যাত্মিক বা নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক বৈধতা ও জনসমর্থন আহরণের একটি শক্তিশালী উপায় হিসেবে ব্যবহারের প্রমাণ মেলে।

জাতীয় পার্টি: ২৬ মে এক জনসভায় জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন,"জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় গেলে ইসলামী মূল্যবোধ জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে।"[৬৯] ২৭ মে চাঁদপুরে অপর এক জনসভায় তিনি বলেন,"জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় গেলে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করবে না।"[৭০] এই বক্তব্যগুলোর মধ্য দিয়ে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক কৌশল স্পষ্ট হয়-ধর্মনির্ভর রাজনীতির মাধ্যমে জনসমর্থন বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে যেসব ভোটার ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসনকে গুরুত্ব দেন, তাদের আস্থা অর্জনই ছিল এ ধরনের বক্তব্যের মূল লক্ষ্য।

ইসলামী ঐক্যজোট: ১৮ মে চাঁদপুর ৩ ও ৫ আসনের ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া নির্বাচনী জনসভায় বলেন,"ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি আশা করা যায় না।"[৭১]এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হিসেবে ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। ২৩ মে চট্টগ্রাম-৮ আসনের প্রার্থীর পক্ষে পাহাড়তলীতে মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, "আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ধার্মিক সৎ, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হইবে অন্যথায় আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে।"[৭২]এর মাধ্যমে ভোটদানকে কেবল নাগরিক অধিকার নয়, বরং ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই দিনে ময়মনসিংহ জেলার নন্দাইল ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে চরমোনাই পীর সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম নির্বাচনকে জিহাদের অংশ মনে করে সবাইকে সময় শক্তি ও অর্থ দিয়ে ঐক্য জোটের প্রার্থীদের বিজয়ী করার আহ্বান জানান।[৭৩] ইসলামী ঐক্যজোটের উল্লিখিত বক্তব্যগুলোতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ধারণা এবং নির্বাচনী সংগ্রামকে জিহাদের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে তারা ভোটারদের কাছে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে।

খ. ৩. ২. দলীয় প্রধানদের মাজার জিয়ারত

নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনসমর্থন অর্জনের কৌশল হিসেবে পীর, দরবেশ ও সুফি-সাধকদের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। মাজার জিয়ারতের এই কার্যক্রমকে ভোটারদের ধর্মীয় আবেগ ও আস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নিম্নে নেতৃবৃন্দের মাজার জিয়ারতের চিত্র উপস্থাপন করা হলো-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ১৪ মে শেখ হাসিনা শাহজালাল (রহ.), শাহ পরান (রহ.) ও সৈয়দ বোরহান উদ্দিন (রহ.) এর মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত ও নামাজ আদায় করে আওয়ামী লীগের বিজয়ের জন্য দোয়া করেন এবং একইসাথে নির্বাচনী প্রচারণাকার্য শুরু করেন (চিত্র-১)।[৭৪] ১৭ মে তিনি বাগেরহাটের প্রখ্যাত আউলিয়া খান জাহান আলী (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করে দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করেন (চিত্র-২)।[৭৫] ২২ মে

নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিনে মিরপুর হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রহ.) এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রহমত কামনা করে শেখ হাসিনা ঢাকায় ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেন।[৭৬] ২৩ মে মতিঝিল-সবুজবাগ থানার মনোনীত প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরীর পক্ষে মাদারটেকের জনসভায় যাওয়ার পূর্বে শেখ হাসিনা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে হযরত শাহ খাজা শরফুদ্দিন চিশতী (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। তিনি মাজারে মুসলিম উম্মাহর জন্য মোনাজাত করেন। এসময় আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এবং ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফ তার সঙ্গে ছিলেন।[৭৭] ২৪ মে হাসিনা সৈয়দপুরে হযরত শাহ রিয়াজুদ্দিনের মাজার জিয়ারত করেন।[৭৮] ২৬ মে শেখ হাসিনা বগুড়ার মহাস্থানের শাহ সুলতান বলখী (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন।[৭৯] দলীয় প্রধানের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য নেতৃবৃন্দও নিজ এলাকার মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ১ জুন ঢাকা-১০ আসনের প্রার্থী ডা. এইচ বি এম ইকবাল পরীবাগ মাজার জিয়ারত শেষে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।[৮০] শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতে বিভিন্ন মাজার জিয়ারতের ঘটনাটি শুধু একটি ধর্মীয় কার্যকলাপ ছিল না, বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল ছিল। এই কৌশলের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়েছেন, জনগণের সাথে ধর্মীয় বন্ধন স্থাপনের চেষ্টা করে রাজনৈতিক ভাবমূর্তি শক্তিশালী করেন এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হন।

চিত্র-১ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত অবস্থায় শেখ হাসিনা।

উৎস: *The BangladeshObserve*, 15 May 1996

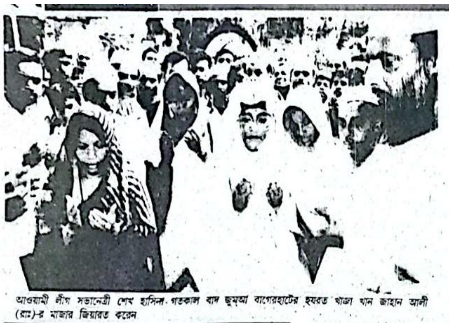

চিত্র-২ খান জাহান (রহ.) এর মাজার জিয়ারত অবস্থায় শেখ হাসিনা।

উৎস: *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ মে ১৯৯৬

বিএনপি: ৯ মে বেগম খালেদা জিয়া সিলেটে শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরানের (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন (চিত্র-৩)।[৮১] ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে জিয়াউর রহমানও শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরানের (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছিলেন।[৮২] ১১ মে বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম নির্বাচনী সফরের প্রাক্কালে আমানত শাহ (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন।[৮৩] ৩০ মে ফেনী সফরকালে বেগম খালেদা জিয়া আলহাজ্ব মোজাহরুল হোসেন মজুমদার ওরফে বোবা পীর পাগলা দরবেশের মাজার জিয়ারত করেন।[৮৪] বেগম খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারতের ঘটনাগুলো তার নির্বাচনী প্রচারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এর মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেন এবং জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েছেন। এই কার্যক্রমগুলো কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল না, বরং এটি শেখ হাসিনার ন্যায় সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল ছিল, যা তার নির্বাচনী প্রচারে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল।

চিত্র-৩ হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত অবস্থায় বেগম খালেদা জিয়া

উৎস: *দৈনিক দিনকাল*, ১০ মে ১৯৯৬

জাতীয় পার্টি: পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.) ও শাহ রুমী (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।[৮৫] আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র দলীয় প্রধানের ন্যায় জাতীয় পার্টির প্রধানও জনসমর্থন বৃদ্ধিও জন্য দেশের প্রখ্যাত সুফি-সাধকের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেন।

খ. ৪. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উৎসবে অনুদান

নির্বাচনের পূর্বে ঈদকে সামনে রেখে সাতক্ষীরা-৪ (দেবহাটা-কালিগঞ্জ) আসনের বিএনপি প্রার্থী ওয়াজেদ আলী বিশ্বাস দুটি থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ১৩টি ইউনিয়নে ৬০০০০ শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেছেন।[৮৬] ঈদ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এ সময় নতুন পোশাকের প্রতি মানুষের চাহিদা থাকে প্রবল। এই সময় উপহার বিতরণ ভোটারদের আবেগ ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে প্রার্থীর সংযোগকে সুদৃঢ় করে।

নির্বাচনী প্রচারণায় মধ্যমপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলো কর্তৃক ধর্মীয় উপাদানের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও বামপন্থী দলগুলোর প্রার্থীরাও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী-খোকসা আসনে জাসদ নেতা নূরে আলম জিকু নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে অন্তত ৩০টি মসজিদে মাইকসেট বিতরণ করেন।[৮৭] বাংলাদেশের গ্রামীণ ও মফস্বল অঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষকরে মসজিদের প্রভাব অনেক বেশি। এ কারণে জাসদ ভোট ব্যাংক সুরক্ষায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করার কৌশল অবলম্বন করেছে। জাসদ আদর্শগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এই কর্মের মাধ্যমে তা লজ্ঘিত হয়েছে।

খ. ৫. নির্বাচনী শ্লোগানে ধর্মের ব্যবহার

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ন্যায় সপ্তম সংসদ নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলো স্লোগানে ধর্মীয় শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করে। নির্বাচনী প্রচারে যেসব স্লোগান প্রচারিত হয় সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো-

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ধর্মীয় শব্দের সমন্বয়ে যেসব শ্লোগান ব্যবহার করে সেগুলো হলো-

- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।'[৮৮]
- আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, নৌকা মার্কায় সীল মার।'[৮৯]

এসব শ্লোগানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বাস্তব রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মীয় ভাষা ও প্রতীক ব্যবহার করে জনসমর্থন বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করে। এটি দেখায় যে, দলটি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী হলেও নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেনি।

বিএনপি: নির্বাচনে ভোটারদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিএনপি যে সব শ্লোগান প্রচার করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ধানের শীষে বিসমিল্লাহ।'[৯০] এই শ্লোগানের মাধ্যমে বিএনপি বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভোটারদের আবেগ ও বিশ্বাসকে লক্ষ্য করেছে। কালেমা ও বিসমিল্লাহর মতো পবিত্র শব্দ ব্যবহারের ফলে নির্বাচনী প্রতীকটি একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লাভ করে, যা সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। এর ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

জামায়াতে ইসলামী: নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়াত সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় স্লোগানের মাধ্যমে ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। জামায়াতের জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত স্লোগানের মধ্যে ছিলো-

- আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।
সকল হাতে কাজ চাই, সবার মুখে ভাত চাই।
দাড়িপাল্লায় ভোট চাই।[৯১]
- 'ভোট দিলে পাল্লায়, খুশি হবে আল্লায়।'[৯২]
- আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।[৯৩]

এসব শ্লোগানের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী ধর্ম, রাজনীতি ও নৈতিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন করেছে। ভোটদানকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি করে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে উপস্থাপন করে দলটি ধর্মপ্রাণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করে। এটি জামায়াতের ধর্মভিত্তিক ডানপন্থী রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে নির্বাচনী ভাষায় প্রকাশ করার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

খ. ৬. নির্বাচনী পোস্টারে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার

নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রার্থী কৌশলে বা সরাসরি তাদের নির্বাচনী পোস্টারে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। যদিও আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ দল তারপরও দলীয় প্রার্থীরা তাদের পোস্টারে-ব্যানারে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান', 'আল্লাহ আকবর', 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে' ইত্যাদি স্লোগান লিখে মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ের কৌশল গ্রহণ করেন (চিত্র-৪)।[৯৪]
বিএনপি'র প্রার্থীরা তাদের প্রচারণা পোস্টারে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', 'আল্লাহু আকবর' এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' উল্লেখ করেন (চিত্র-৫)।[৯৫]
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী পোস্টারে,' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চাই'[৯৬] লিখে মুসলিম ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে (চিত্র-৬)।

চিত্র-৪ উৎস: *দৈনিক বার্তা*, ৬ জুন ১৯৯৬

চিত্র-৫ উৎস: দৈনিক দিনকাল, ৯ জুন ১৯৯৬

চিত্র-৬ উৎস: দৈনিক সংগ্রাম, ৪ জুন ১৯৯৬

নির্বাচনী ফলাফল

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ এ ৮১টি রাজনৈতিক দল দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করে।[৯৭] অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোট এর শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

রাজনৈতিক দল	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১,৫৮,৮২,৭৯২	৩৭.৪৪	১৪৬
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	১,৪২,৫৫,৯৮৬	৩৩.৬০	১১৬
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৬৯,৫৪,৯৮১	১৬.৪০	৩২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩৬,৫৩,০১৩	৮.৬১	৩
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৬	৪,৬১,০০৩	১.০৯	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (রব)	৬৭	৯৭,৯১৬	০.২৩	১
স্বতন্ত্র	৮৬৪	৪,৫০,১৩২	১.০৬	১
অন্যান্য দল	৮৬৪	৬,৬৬,৪৭৬	১.৫৭	০
			মোট	৩০০

উৎস: *Statistical Report 7TH Jatiyashangshad Election-1996* (Dhaka: Bangladesh Election Commission, 1996), p. 9

নির্বাচনী ফলাফলে ডানপন্থী রাজনীতির প্রভাব

এই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল শতকরা ৭৪.১৫ ভাগ। আওয়ামী লীগ শতকরা ৩৭.৪৪ ভাগ ভোট ও ১৪৬টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিএনপি শতকরা ৩৩.৬১ ভাগ ভোট ও ১১৬টি আসন লাভ করে। শতকরা হিসাবে জাতীয় পার্টি পায় ১৬.৪০ ভাগ ও ৩২টি আসন, জামায়াত-ই-ইসলামী পায় ৮.৬১ ভাগ ও ৩টি আসন, ইসলামী ঐক্য জোট পায় ১.০৯ ভাগ ও একটি আসন এবং জাসদ (রব) পায় ০.২৩ ভাগ ভোট ও একটি আসন।[৯৮] এই নির্বাচনে লক্ষ্যণীয় দিক হলো বামপন্থী ও ডানপন্থী দল বিশেষকরে জামায়াতে ইসলামীর ভোট বিপর্যয় ঘটে। অন্যদিকে সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রয়োজনীয় ১৫১টি আসন অর্জিত না হওয়ার কারণে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (রব) এর সমন্বয়ে ঐক্যমত্যের সরকার গঠনের মাধ্যমে দীর্ঘ ২১ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দক্ষতার সঙ্গে ডানপন্থী রাজনৈতিক অনুসঙ্গসমূহ

নিজেদের প্রচারণায় অন্তর্ভুক্ত করে, যা ভোটারদের বড় অংশকে প্রভাবিত করে এবং তাদের বিজয়কে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন-

প্রথাগত সেক্যুলার ইমেজ থেকে দূরে সরে আসা: দলীয় গঠনতন্ত্রের বিবেচনায় আওয়ামী লীগ সেক্যুলার রাজনৈতিক দল। পঞ্চম সংসদ (১৯৯১) নির্বাচনের প্রাক্কালে দলটির প্রচারণায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালের ২১ জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা বলেন, "আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনা পুনরুদ্ধার করা হবে, সংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র পুনর্বহাল করা হবে।"[৯৯] একইভাবে ৩১ জানুয়ারি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় (মোহনপুর, বাগমারা, পুঠিয়া, চারঘাট,বাঘা) জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেন,"ইসলামেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে।"[১০০] এসব বক্তৃতার মাধ্যমে শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সাংবিধানিকভাবে পুনর্বহালের এবং সেইসাথে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দানের ইঙ্গিত দেন।

তবে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগের অবস্থানে একটি কৌশলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেখ হাসিনা পূর্বের সেক্যুলার ভাষ্য থেকে সরে এসে প্রচারণায় ধর্মীয় বাক্য ব্যবহারে জোর দেন। অধিকাংশ ভাষণে ধর্মীয় শব্দ ও উক্তি বিশেষত 'ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর মেহেরবানীতে,...' ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সালের ১১ মে বিএনপি নেতা উইং কমান্ডার (অব.) হামিদুল্লাহ খান ও হাজি সেলিমের আওয়ামী লীগে যোগদান অনুষ্ঠানে বলেন,"ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন আওয়ামী লীগকে জনগণ নির্বাচনে জয়ী করবে ইনশাআল্লাহ"[১০১]; পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, একই বছরের ৩১ মে ফেনীতে শেখ হাসিনা বলেন, "আল্লাহর মেহেরবানীতে জনগণের ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সেই সরকার জনগণের সেবক হবে।"[১০২] এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা সেক্যুলার ইমেজ থেকে সরে এসে ধর্মীয় ভাষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এক প্রকার ধার্মিক ও ধর্ম-সহনশীল ইমেজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

ধর্মীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করা: নির্বাচনের পূর্বে সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পরিবারের ১০ জন সদস্যসহ ২৩ এপ্রিল হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করেন এবং ১ মে দেশে ফিরে আসেন।[১০৩] হজ্ব পালনের পরবর্তীতে শেখ হাসিনা মাথায় হিজাব ব্যবহার শুরু করেন এবং প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে তাঁকে হিজাব পরিহিত অবস্থায় যোগদান করতে দেখা যায় (চিত্র-১, ২, ৭, ৮) । এছাড়াও নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার হিজাব পরিহিত, তসবিহ হাতে এবং মোনাজাতরত ছবি সম্বলিত পোস্টার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি নির্বাচন পরবর্তী শপথগ্রহণকালেও হিজাব পরিহিত ও তসবিহ হাতে দেখা যায় (চিত্র-৮)। তবে পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে তাঁকে হিজাব পরিহিত বা তসবিহ হাতে আর দেখা যায়নি। এছাড়াও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা তিনি শুরু করেন সিলেটের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র শাহ জালাল (রহ.) ও শাহ পরাণ (রহ.) এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১৯৯১) প্রচারণা তিনি শুরু করেছিলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি জিয়ারতের মাধ্যমে। এই কৌশলগত পরিবর্তন-ধর্মীয় আবরণ গ্রহণ ও আধ্যাত্মিক প্রতীক ব্যবহার-জনগণের কাছে শেখ হাসিনাকে একজন ধার্মিক ও ধর্মনিষ্ঠ নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্য অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্র-৭ হজ্ব পালন শেষে হিজাব পরিহিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন
উৎস: ভোরের কাগজ ৩ মে ১৯৯৬

চিত্র-৮ হিজাব পরিহিত ও তসবিহ হাতে শপথগ্রহণ
উৎস: দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ জুন ১৯৯৬

জামায়াতের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন দীর্ঘদিন ধরে মূলত বিএনপি'র পক্ষে বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ সমঝোতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, যখন জামায়াত কৌশলগত কারণে প্রায় ৮০টি আসনে প্রার্থী দেয়নি যা বিএনপি'র জয়ের পথ সুগম করেছিল। এ প্রসঙ্গে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, "যেখানে জামাতের প্রার্থীর তুলনায় সমমনা কোন দলের প্রার্থীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল, সেখানে জামাতের প্রার্থী দেয়া হয়নি। বিএনপি'র পক্ষে কতজন প্রার্থী প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার কোন সঠিক সংখ্যা জানা নেই বলে অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান।"[১০৪] এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, জামায়াত তখন বিএনপি'র সঙ্গে আদর্শগত ও কৌশলগত নৈকট্য বজায় রেখেছিল।

তবে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১৯৯৬) প্রাক্কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন আসে। আওয়ামী লীগ, যাদের মূল রাজনৈতিক অবস্থান ছিল সেক্যুলার এবং যারা প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। তখন কৌশলগত কারণে ডানপন্থী দল জামায়াতকে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে বিএনপি সরকারের বিরোধিতায় গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আস্থা ফিরিয়ে (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) আনার দাবিতে আওয়ামী লীগ একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলে, যার মধ্যে জামায়াতও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ছিল ভোটভিত্তিক বিভক্ত করা এবং বিএনপি'র প্রভাবশালী সমর্থনক্ষেত্রকে দুর্বল করা। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে বিএনপি'র সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করে পূর্ণমাত্রায় (৩০০ আসনে) প্রার্থী দিতে উৎসাহিত করেছিল। যদিও আওয়ামী লীগ-জামায়াত ঐক্য দীর্ঘমেয়াদি আদর্শগত জোট হিসাবে রূপ নেয়নি, তবে এ কৌশল নির্বাচনী অঙ্কের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এতে বিএনপি'র ভোট ব্যাংক বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু আসনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়, যা আওয়ামী লীগের জন্য সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "বিএনপি'র সাথে জামাতের নির্বাচনী আঁতাত না থাকার কারণে জামাত মাত্র তিনটি আসন পায় এবং বিএনপি'র ১৭ জন সাবেক মন্ত্রী হেরে যান।"[১০৫]

রাজনৈতিক যোগাযোগ ও জোট রাজনীতির এই পরিবর্তন নির্বাচনী ফলাফলের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এই অস্থায়ী সমঝোতা কেবল ভোট বিভাজনের কৌশল নয়, বরং বৃহত্তর বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল। ফলে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে এ কৌশলও এক ধরণের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যক্তি মালিকানার প্রতিশ্রুতি: পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্ষে প্রচারণা চালায় যা তাদের পরাজয়ের কারণকে ত্বরান্বিত করেছিলো। এ কারণে সপ্তম সংসদ নির্বাচনে দলটি কৌশল পরিবর্তন করে ব্যক্তিমালিকানা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে প্রচারণা চালায়। তাদের এই প্রচারণা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বিশ্বাস অর্জন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৯১) আওয়ামী লীগ তার প্রচারণায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। তবে সেই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতির উত্থানের কারণে সমাজতন্ত্রমুখী নীতি সাধারণ জনগণের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বেসরকারি উদ্যোগ ও বিদেশি বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি একটি উন্মুক্ত অর্থনৈতিক নীতির পক্ষে ঝুঁকতে শুরু করে। এর ফলে দলটি নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১৯৯৬) প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক কৌশল ও নীতি নতুনভাবে সাজায়। দলটি সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিমালিকানা, বেসরকারি উদ্যোগের বিকাশ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতি সমর্থন জানায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে (৫ ও ৬ নং দফায়) এবং নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসার, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নতুন অর্থনৈতিক অবস্থান বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলে। তারা মনে করে, আওয়ামী লীগের এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। ফলে দলের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন শুধু ভোটের হিসাবেই নয়, বরং তাদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের কৌশল হিসেবেও কাজ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাফল্যের পেছনে এই অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

গণমাধ্যম: নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের ডানপন্থী নীতি গ্রহণ এবং তা জনসমক্ষে উপস্থাপন ও প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম, বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া, তুলনামূলকভাবে উদার ও সহনশীল ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগের নীতি ও কৌশলকে অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা ভোটারদের কাছে দলের ভাবমূর্তি শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। গণমাধ্যমের এ ধরণের সহায়ক মনোভাব আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।

পুঁজিপতিদেরকে দলীয় মনোনয়োন: আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ধরে গণমানুষের দল হিসেবে নিজেদের প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। তবে সময়ের সাথে সাথে দলীয় মনোনয়নে ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতিদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে শতকরা ২৬.৯ জন ছিলেন ব্যবসায়ী শ্রেণির, আর ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এই হার ছিল শতকরা ২৩.৭ জন।[১০৬] কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫৩ জন ছিলেন ব্যবসায়ী, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনীত সদস্যদের শতকরা ২৭ জন এবং বিএনপি'র নির্বাচিত ১৪০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬৬ জন ব্যবসায়ী শ্রেণীর ছিলেন।[১০৭]

সপ্তম জাতীয় সংসদে (১৯৯৬) এই প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। নির্বাচিত ১৫২ জন সংসদ সদস্য ব্যবসায়ী শ্রেণিভুক্ত ছিলেন, যা সংসদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হিসেবে তাদের

প্রতিষ্ঠিত করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিজয়ী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল প্রায় শতকরা ৪৩ জন।[১০৮] এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতিতে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতি শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি'র প্রার্থী মনোনয়নে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য পাওয়ায় আওয়ামী লীগও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশল হিসেবে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবসায়ী শ্রেণিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এটি শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় নয়, বরং রাজনৈতিক অর্থায়ন, নির্বাচনী প্রচারণা এবং ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি কৌশল হিসেবেও কাজ করে। এভাবে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বৃদ্ধি মূলত ডানপন্থী রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করে।

উপসংহার: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও ডানপন্থী রাজনীতির প্রচারণা ভাষ্যের বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমত, নির্বাচনী প্রচারণায় চারটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলসহ জাকের পার্টি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বেসরকারি খাত ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে ভোটারদের কাছে আধুনিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। অন্যদিকে জামায়াত, জাকের পার্টি যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিকে নির্বাচনী কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। উল্লেখ যে যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানায় সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদী আবেগকে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকে নির্বাচনী ভাষ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত করেছে। জামায়াতে ইসলামী, জাকের পার্টি, ইসলামী মোর্চা, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী ফ্রন্ট, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মকে শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

তৃতীয়ত, নির্বাচনী প্রচারণায় মাজার জিয়ারত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক উপহার বিতরণের মতো কার্যক্রম ভোটারদের সাথে আবেগপূর্ণ সংযোগ স্থাপন এবং রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো কেবল তাদের রাজনৈতিক পরিচয়কে শক্তিশালী করেনি, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করতেও সক্ষম হয়েছে।

চতুর্থত, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগর পূর্বের চেয়ে (৫ম সংসদ নির্বাচন) অধিক পরিমাণে ডানপন্থী রাজনীতির কৌশলগত প্রয়োগ করেছে। যা তাদের নির্বাচনে বিজয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণার ভাষ্য এবং প্রতীক ব্যবহার শুধু ভোট প্রভাবিত করার হাতিয়ার নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সমর্থকদের মনোভাব এবং দলের আদর্শগত অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রমাণ করে যে, ডানপন্থী রাজনীতির প্রভাব বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি সুসংহত কৌশল হিসেবে কাজ করে। এই কৌশলটি অর্থনীতি, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়ে ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নির্বাচনী বিশ্লেষণ ও গবেষণায় কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং প্রচারণার ভাষ্য, প্রতীক এবং কৌশলের মতো বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। এই পর্যবেক্ষণগুলোই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গতিপথ বুঝতে সাহায্য করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ নির্বাচনে বিএনপিসহ ৪১টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। অন্য ৪০টি দলের মধ্যে গণঅধিকার ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জনতা পার্টি, মুসলিম লীগ (জমির আলী) এনডিপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, ফ্রীডম পার্টি, জাতীয় মুক্তি দল, মুসলিম লীগ, জনদল, ইউ ডি এ, ডেমোক্রেটিক লীগ, ন্যাশনাল ফ্রন্ট, বেকার সমাজ, দেশপ্রেমিক জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা, মাওলানা ভাসানী স্বপ্ন বাস্তবায়ন পরিষদ, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি,বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনসহ অন্যান্য দলগুলোর পরিচিতি ও গণভিত্তি খুবই দূর্বল এবং নাম সর্বস্ব। [উদ্ধৃত- সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০২০), পৃ. ৪১-৪৩; *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬ ।]

২ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬; সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*।

৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১ মার্চ ১৯৯৬ ।

৪ ডানপন্থীঃ ফরাসি শব্দ Aile droite এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Right wing থেকে 'ডানপন্থা' এসেছে। 'ডানপন্থী' শব্দটি ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় ফরাসি জাতীয় পরিষদের আসন বিন্যাস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সেই সময়ে, যারা স্পিকারের ডানদিকে বসতেন তারা সাধারণত রাজা এবং ঐতিহ্যগত অনুক্রমের সমর্থক, মননে রক্ষণশীল এবং রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মী ছিলেন। *দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া* অনুসারে-Right wing refers to a conservative, traditional group or a political party. In some legislative bodies, the conservatives sit to the right of the speaker. আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Herbert Kitschelt এর মতে- "Right -wing parties often combine free-market economies with cultural conservatism. [তথ্যসূত্র: Herbert Kitschelt, *The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis* (Michigan: The University of Michigan press, 1995), pp. 15-35.]

অনেক ক্ষেত্রে 'ডানপন্থীর' পরিবর্তে 'দক্ষিণপন্থী' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়? এর পেছনে কয়েকটি যুক্তিও রয়েছে- প্রথমত-বাংলা একাডেমি প্রণীত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* এ 'ডান' শব্দের অর্থ দক্ষিণ, যেমন- দক্ষিণ হস্ত। দ্বিতীয়ত- সাম্প্রতিক দেশি-বিদেশি (*প্রথম আলো*, *ডয়চে ভেলে*, *বিবিসি*, *দ্যা হিন্দু*) বাংলা প্রিন্ট মিডিয়ায় (সংবাদপত্র ও সাময়িকী) ডানপন্থীর পরিবর্তে 'দক্ষিণপন্থী' উপস্থাপন করার কারণে শব্দটি (দক্ষিণপন্থী) বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। তৃতীয়ত-দেশের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানি-এমাজউদ্দীন আহমদ, বদরুদ্দীন উমর, মাহবুব উল্লাহ; ইতিহাসবিদ-সৈয়দ আনোয়ার হোসেন; রাজনীতি বিশ্লেষক-মওদুদ আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখ তাদের লেখনিতে দক্ষিণপন্থী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে বাংলাদেশের একাডেমিক সোসাইটিতে 'ডানপন্থী' শব্দটি বিশেষভাবে পরিচিতি থাকায় বর্তমান প্রবন্ধে 'ডানপন্থী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ডানপন্থী রাজনীতি বিশেষত জাতীয়তাবাদের উপর জোর দেওয়া, মুক্তবাজার অর্থনীতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে, পুঁজিপতিদের রক্ষা, রাজনীতিতে ধর্মীয় ভাবাদর্শের ব্যবহার, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে রক্ষা এবং রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখাকে বোঝায়।

৫ আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র-১৯৯১-২০০৮* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৬), পৃ. ১৫৭-১৯২।

৬ দেওয়ান গৌস সুলতান, *বিশ শতকে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০২৩) পৃ. ৬২৮-৬৮০।

৭ আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৩), পৃ.২২০-২৩০।

৪ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০২০), পৃ.২৭-৬৫।

৯ Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization* (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2015), pp. 46-49.

১০ Md. Akmal Hossain, "God and the Ballot Box: How Electoral Candidates Use Religion in Election Campaign in Bangladesh", *Journal of Asian and African Studies*, 2024, pp. 1-15. doi.org/10.1177/002190962412843

[১১] Rounaq Jahan, "Political Parties, Movements, Elections and Democracy in Bangladesh," Gyantapas Abdur Razzaq Distinguished Lecture, Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka, January 27, 2018, pp. 9-11. https://cpd.org.bd/resources/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf

[১২] আলী রিয়াজ, "বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি", *সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ*, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ৪-১১।
https://www.cgs-bd.com/cms/media/documents/593685a4-35dd-4c76-ac71-a9d2cb3600e9.pdf

[১৩] এস. এম. মফিজুর রহমান, "বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম", *পিএইচডি অভিসন্দর্ভ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০১৯), পৃ. ১৮৯-১৯৫।

[১৪] Md. Abdul Maleque, "PRESSURE GROUPS IN BANGLADESH POLITICS", *PhD Dissertation* (University of Dhaka: Department of Political Science, 2003), pp. 199-200.

[১৫] *ভোরের কাগজ*, ১১ মে ও ১০ জুন ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১১ মে ১৯৯৬, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১১ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ১৯৯৬।

[১৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ* , ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৯৬।

[১৭] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ মে ১৯৯৬।

[১৮] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ১০ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১০ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ১৪ মে ১৯৯৬।

[১৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ১৯৯৬।

[২০] *ভোরের কাগজ*, ১১ মে ও ১০ জুন ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১১ মে ১৯৯৬, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১১ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ১৯৯৬।

[২১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ* , ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৯৬।

[২২] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ মে ১৯৯৬।

[২৩] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ১০ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১০ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ১৪ মে ১৯৯৬।

[২৪] *ভোরের কাগজ*, ১১ মে ও ১০ জুন ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১১ মে ১৯৯৬, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১১ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ১৯৯৬।

[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ* , ১৯ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১৯ মে ১৯৯৬।

[২৬] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ মে ১৯৯৬।

[২৭] *সংবাদ*, ১০ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ১৪ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ১০ মে ১৯৯৬।

[২৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ১৯৯৬।

[২৯] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ মে ১৯৯৬।

[৩০] *প্রাগুক্ত*, ২৩ মে ১৯৯৬।

[৩১] *দৈনিক দিনকাল*, ১৪ মে ১৯৯৬।

[৩২] *THE BANGLADESH OBSERVER*, 29 May 1996.

[৩৩] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১ জুন ১৯৯৬।

৩৪ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১ জুন ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ১ জুন ১৯৯৬।
৩৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মে ১৯৯৬।
৩৬ *ভোরের কাগজ*, ৫ মে ১৯৯৬।
৩৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মে ১৯৯৬।
৩৮ *প্রাগুক্ত*, ২০ মে ১৯৯৬।
৩৯ *প্রাগুক্ত*, ২৪ মে ১৯৯৬।
৪০ *প্রাগুক্ত*, ২৯ মে ১৯৯৬।
৪১ *প্রাগুক্ত*, ৩১ মে ১৯৯৬।
৪২ *সংবাদ*, ৪ জুন ১৯৯৬।
৪৩ *ভোরের কাগজ*, ১২ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১২ মে ১৯৯৬।
৪৪ *দৈনিক দিনকাল, ১৫ মে ১৯৯৬*।
৪৫ *প্রাগুক্ত, ১৬ মে ১৯৯৬*।
৪৬ *প্রাগুক্ত*, ৩ মে ১৯৯৬।
৪৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ মে ১৯৯৬।
৪৮ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ মে ১৯৯৬।
৪৯ *দৈনিক দিনকাল*, ২১ মে ১৯৯৬।
৫০ *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩ জুন ১৯৯৬।
৫১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ জুন ১৯৯৬।
৫২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ মে ১৯৯৬।
৫৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫ মে ১৯৯৬।
৫৪ *ভোরের কাগজ*, ৩ জুন ১৯৯৬।
৫৫ *সংবাদ*, ৫ মে ১৯৯৬।
৫৬ *প্রাগুক্ত*, ১২ মে ১৯৯৬।
৫৭ *ভোরের কাগজ*, ২৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৩ মে ১৯৯৬।
৫৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ১৮ মে ১৯৯৬।
৫৯ *সংবাদ*, ২০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মে ১৯৯৬।
৬০ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৮ মে ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ২৮ মে ১৯৯৬।
৬১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৭ মে ১৯৯৬।
৬২ *প্রাগুক্ত*, ১১ মে ১৯৯৬।
৬৩ *দৈনিক দিনকাল*, ১৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মে ১৯৯৬; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ মে ১৯৯৬।
৬৪ *THE BANGLADESH OBSERVER*, 1 June 1996.
৬৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মে ১৯৯৬।
৬৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ মে ১৯৯৬।
৬৭ *তদেব*।
৬৮ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ জুন ১৯৯৬।
৬৯ *প্রাগুক্ত*, ২৭ মে ১৯৯৬।
৭০ *প্রাগুক্ত*, ২৮ মে ১৯৯৬।
৭১ *দৈনিক দিনকাল*, ১৯ মে ১৯৯৬।
৭২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ মে ১৯৯৬।
৭৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ মে ১৯৯৬।
৭৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মে ১৯৯৬; *ভোরের কাগজ*, ১৫ মে ১৯৯৬; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ মে ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১৫ মে ১৯৯৬।

৭৫ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ মে ১৯৯৬।

৭৬ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মে ১৯৯৬।

৭৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ মে ১৯৯৬।

৭৮ *প্রাগুক্ত*, ২৫ মে ১৯৯৬।

৭৯ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৭ মে ১৯৯৬।

৮০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ১৯৯৬।

৮১ *ভোরের কাগজ*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে ১৯৯৬; *দৈনিক দিনকাল*, ১০ মে ১৯৯৬, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯৯৬; *সংবাদ*, ১০ মে ১৯৯৬।

৮২ *আজাদ*, ২ জুন ১৯৭৮।

৮৩ *ভোরের কাগজ*, ১০ মে ১৯৯৬; *THE BANGLADESH OBSERVER*, 12 May 1996.

৮৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩১ মে ১৯৯৬।

৮৫ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মে ১৯৯৬।

৮৬ *সংবাদ*, ৮ মে ১৯৯৬।

৮৭ *দৈনিক দিনকাল*, ১৩ মে ১৯৯৬; *দৈনিক মিল্লাত*, ১৩ মে ১৯৯৬।

৮৮ ভোরের *কাগজ*, ১ জুন ১৯৯৬; আবু সাঈদ খান, *স্লোগানে স্লোগানে রাজনীতি* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০), পৃ. ১৪৮।

৮৯ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৯ মে ১৯৯৬।

৯০ আবু সাঈদ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

৯১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ জুন ১৯৯৬।

৯২ আবু সাঈদ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩।

৯৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ জুন ১৯৯৬।

৯৪ *দৈনিক বার্তা*, ৬ জুন ১৯৯৬; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশ: *রাজনৈতিক সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪), পৃ. ১৫২।

৯৫ *দৈনিক দিনকাল*, ৯ জুন ১৯৯৬।

৯৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ জুন ১৯৯৬।

৯৭ *STATISTICAL REPORT 7TH JATIYASHANGSHAD ELECTION-1996* (Dhaka: Bangladesh Election Commission, 1996), pp.19-21.

৯৮ *Ibid*, p. 9.

৯৯ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ জানুয়ারি ১৯৯১।

১০০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

১০১ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ মে ১৯৯৬।

১০২ *ভোরের কাগজ*, ১ জুন ১৯৯৬।

১০৩ *প্রাগুক্ত*, ৩ মে ১৯৯৬।

১০৪ *সংবাদ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯১।

১০৫ মহিউদ্দিন আহমদ, *বিএনপি সময়-অসময়* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬), পৃ. ২৫১।

১০৬ Jahan, Rounaq. "Members of Parliament in Bangladesh." *Legislative Studies Quarterly* 1, no. 3 (1976): 359. https://doi.org/10.2307/439502.

১০৭ আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯), পৃ. ৩৮; উদ্ধৃত-আহম্মেদ শরিফ, "বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র: ১৯৯১-২০০৮" *এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, ২০১৪), পৃ. ৯৮।

১০৮ আহম্মেদ শরিফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।